এই সময়
সংবাদপত্র

কথা সরিৎ

দয়ালু দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় ফাঁকি দেয়,
হিংসালু দেবতাকে দেয় দামী অর্ঘ্য।
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সতর্কতা

দু'টি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুমাত্রিক। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার জটিলতর রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে। এবং বিদেশনীতির মাত্রাগুলির গতিপথ যে কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে, সেই সম্ভাবনাটিও ব্যতিক্রমী কিছু নয়। এটিই আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তব। অতএব এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের সম্পর্ক নিবিড়তর করার অর্থ এই নয় যে সম্পর্কের সবটুকুই শান্তিকল্যাণ। চিনা বিদেশমন্ত্রীর সাম্প্রাতিক দু'দিন ব্যাপী ভারত সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, চিন ও ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ধারাটিকে সবলতর করে তোলা। এটিতে আপত্তির কিছু নেই। বস্তুত ভারতও চিনা নাগরিকদের ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়াটি সহজতর করার চেষ্টা করছে। কিন্তু যেটি উদ্বেগের সংবাদ তা হল, চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর, সংক্ষেপে সিপিএসি সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। চিনা আধিকারিকদের সঙ্গে পাকিস্তানি সামরিক নেতৃবৃন্দের একটি গোপন পরিকল্পনা নির্মীয়মাণ, যৌথ উদ্যোগে অত্যাধুনিক জেট এবং অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা, যেটি উল্লিখিত সিপিএসি-রই অঙ্গ। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, পাকিস্তানই একমাত্র বিদেশি রাষ্ট্র যারা চিনের বেয়িদ্যু স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করতে পারে।

উদ্যোগটি নিয়ে ভারতের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, কারণ এর ফলে সবাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভারতই। অন্য দিকে, ভারত চিনা টেলিকম সংস্থা হুয়াওয়েই-কে ৫জি পরিকাঠামো পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। মনে রাখা দরকার, পশ্চিমি দেশগুলিতে উল্লিখিত সংস্থাটিকে নিঃশর্ত প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি কারণ তাদের যন্ত্রাদিতে গোপন নজরদারি ব্যবস্থার অভিযোগ, যার মাধ্যমে চিনা গোয়েন্দা সংস্থার কাছে তথ্য সরবরাহ করা হয়। ইতিমধ্যেই চিন সিপিইসি-র ক্ষেত্রে কথার খেলাপ করেছে। সেটি স্রেফ অসামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে, এমত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে। অতএব এমন একটি আশঙ্কা নাকচ করা যায় না যে, চিন ও পাকিস্তান মিলিত ভাবে হুয়াওয়েই-র পরিকাঠামোর সুযোগ নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাল মারফৎ আক্রমণ শানাতে পারে। ইতিমধ্যেই এমত সম্ভাবনা আঁচ করে টেলিকম ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই প্রেক্ষিতে সতর্কতাই বাঞ্ছনীয়। নিজের ক্ষতি করে প্রতিবেশীর উপকার করা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়, বিশেষ যখন সে প্রতিবেশী উপকারের প্রতিদান দিতে নিস্পৃহ।

স্বপ্নপ্রয়াণ

কারও কাছে আজও ঘুমের ঘোরে চুপি চুপি সান্তা ক্লজ বালিশের তলায় বা মোজায় ভরে রেখে যায় মনের বাসনা, আর কোথাও এমত ভাবনা নিতান্তই শিশু ভোলানো ছল। সম্প্রতি এক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, এ কালের অধিকাংশ বাচ্চাই আট বছর বয়সেই বুঝে যায়, সান্তা ক্লজ 'অসত্য'। একই সঙ্গে সে সমীক্ষায় এমনও দেখা গিয়েছে, যে অন্তত ৩৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মনেপ্রাণে এখনও চান তা বিশ্বাস করতে। ভেবে নেওয়া খুব অসঙ্গত হবে কি, যে এমন বাসনা আদতে ক্রমবর্ধমান কণ্টকময় বর্তমানে বিরক্ত হয়েই! মাত্র আট বছর বয়সেই সান্তা-ভাবনার মৃত্যু যেমন হয়তো নিষ্পাপ এক ক্ষণের

হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যে নির্বাচনী জয় কংগ্রেসকে মানসিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে উজ্জীবিত করবে

কংগ্রেসের জিত নাকি বিজেপির হার, সেটাই প্রশ্ন

মতাদর্শগত রূপান্তর ছাড়া, স্রেফ বিরোধিতাকে হাতিয়ার করে কংগ্রেস বিজেপি-র বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হয়ে উঠতে পারবে না। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

এস এল শান্তকুমার

গত এগারো ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী। তেলেঙ্গানা ও মিজোরামে আঞ্চলিক দলগুলোর শক্তি বৃদ্ধি। হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যে কেন্দ্রের শাসক দলের শুধু পরাজয়ই হয়নি বরং বছরের পর বছর ওই সমস্ত রাজ্যে যে সব জায়গা তাদের 'গড়' বলে পরিচিত ছিল সেখানেও তারা ধূলিসাৎ। এবং ২০১৪-র তুলনায় তাদের ভোট তাৎপর্যপূর্ণ হারে কমেছে। নির্বাচনী বিশ্লেষক এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা অনেকেই এই নির্বাচনগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। কিন্তু যেটা এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, বিজেপির বিকল্প হিসেবে কোন রাজনৈতিক শক্তি আগামী লোকসভা নির্বাচনে মানুষের মন জয় করতে পারবে? গত বছর ডিসেম্বরে গুজরাট বিধানসভা থেকেই বিজেপির জনসমর্থন কমার লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তার পর মার্চে কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে এবং মে মাসে বেশ কয়েকটি উপনির্বাচনে এক দিকে বিজেপির পরাজয় এবং অন্য দিকে কংগ্রেস ও আঞ্চলিক দলগুলোর শক্তিবৃদ্ধি লক্ষ করা যাচ্ছিল। হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেস শুধু মনোবল ও সাংগঠনিক দিক থেকে চাঙ্গাই হল না, বিজেপি-কে যে তারা পরাস্ত করতে সক্ষম সেটাও মানুষের সামনে পরিষ্কার হল। কিন্তু এই জয় কি কংগ্রেসের জয়? নাকি প্রধানমন্ত্রী ও হিন্দি বলয়ের মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ? নির্বাচনী রাজনীতিতে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিকল্প নির্মাণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস কি আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে একটি বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প নীতি তুলে ধরতে পারবে?

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের আগে অমর্ত্য সেন একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে ভারতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টি ও ব্রিটেনের টোরিদের মতো ধর্মীয় উন্মাদনা-বিবর্জিত, বাজারমুখী ও ব্যবসা-কেন্দ্রিক দক্ষিণপন্থী দল পাওয়া যায় না। ১৯৬০-র দশকে স্বতন্ত্র পার্টি একটু সাড়া জাগালেও ১৯৭০-র দশক থেকেই সেই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ লিবেরটারিয়ান দল আর ভারতীয় রাজনীতিতে দেখা যায়নি। অন্য দিকে ভারতের কমিউনিস্টরা আবার চিনের বাজারমুখী অর্থনীতি মাথায় না রেখে কেন শুধু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুরনো বুলি আওড়ান সেই বিষয়েও তিনি দুঃখ করেছিলেন। উনি ভারতীয় রাজনীতির দুটো ভিন্ন ধারা (দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী) যাতে শক্তপোক্ত হয় সেই আশা করেছিলেন।

ভারতীয় রাজনীতির তাই দুটো ট্র্যাজেডি। এক, স্বতন্ত্র পার্টির মতো ধর্মনিরপেক্ষ দক্ষিণপন্থী দলের পরিবর্তে আগ্রাসী একটি সংখ্যাগুরুবাদী দলের দাপাদাপি, যাদের সেনানীগণ সংখ্যালঘু, দলিত এবং যুক্তিবাদী মানুষের উপর হয় নিজেরা আক্রমণ করেছে অথবা ওই ধরনের কর্মকে প্রশ্রয় দিয়েছে। আর দ্বিতীয়, শক্তিশালী বামপন্থী রাজনীতির বদলে একটি ম্রিয়মান ও গাঁট রাজনীতির আবির্ভাব। ওনার সঙ্গে একমত হয়ে তৃতীয় একটি ট্র্যাজিক দিকের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তা হল, জাতীয় স্তরে ভারতে শক্তিশালী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলের অভাব। পুরনো ধাঁচের ইউরোপীয় ঘরানার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলগুলো (ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি, ফ্রান্সের সোশ্যালিস্ট পার্টি, জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি) অনেকেই নব-উদারবাদের গড্ডলিকা প্রবাহে পড়ে গরিব মানুষের স্বার্থের থেকে ধনীদের স্বার্থ বেশি দেখেছিল। এই হালই কংগ্রেস দলটির হয়েছিল ১৯৯০-র দশক থেকে। ২০০৪ সালের পর থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ কিছু জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ করলেও ধনী-গরিবের মধ্যে এক দিকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অন্য দিকে বড়ো আর্থিক কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির যে ভূরিভূরি অভিযোগ উঠল, তার জন্য ভারতে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ভাবে একটি অতি-দক্ষিণপন্থী দল আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হল। সেই দল, অমর্ত্য সেন-এর একটি বিখ্যাত বক্তৃতার ('দ্য আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া') ভাষায় 'সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট' ভাবধারার দ্বারা পুষ্ট। গত দেড় দশকে বামপন্থী রাজনীতির যে বিবর্তন, বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকায় এবং হাল আমলে ইউরোপে ঘটেছে, তা কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পুরনো সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক ঘরানার রাজনীতির থেকে আলাদা।

ইউরোপের পুরাতন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলগুলো নব-উদারবাদকে উদার হস্তে আলিঙ্গন করেছিল। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ল্যাটিন আমেরিকায় বেশ কয়েকটি দেশে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক ঘরানার এমন কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপ করা হল যা নব-উদারবাদী অর্থনীতির প্রবক্তাদের মোটেই পছন্দ হবে না। ব্রিটেনেও দেখা গেল জেরেমি করবিনের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি-র মধ্যে নব-উদারবাদী ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে কেইনসীয় নীতি অবলম্বনের দাবি। বামপন্থীদের মধ্যে অনেকে বলতে পারেন যে এই প্রচেষ্টাগুলো করে কী লাভ হল? কারণ ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনায় মধ্য-বামপন্থী শক্তিগুলো ক্ষমতা হারিয়েছে আর ভেনেজুয়েলায় তারা যে কোনও সময়ে ক্ষমতা হারাতে পারে। অন্য দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্নি স্যান্ডার্স-এর হাতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি-র নেতৃত্ব গেল না আর ব্রিটেনে এখনও পর্যন্ত করবিন শক্তিশালী বিরোধী হলেও ক্ষমতা থেকে দূরে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে সামাজিক ভাবে মানুষ যেগুলো নিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক কথোপকথন করছে তার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তি ও ভাতার ক্ষেত্রে সরকারের যে একটা ভূমিকা আছে তা গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দিকে আর্থিক বৈষম্য ও কর্মসংস্থানের ইস্যুগুলো যে আবার উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে এবং পশ্চিম ইউরোপে নতুন মাত্রা পাচ্ছে তার পিছনে নব্য ঘরানার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতির ভূমিকা মোটেই কম নয়। ভারতীয় বামপন্থীদের মধ্যে অনেকে আবার বলতে পারেন যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতি করে পুঁজিবাদের অবসান তো আর হবে না? তা হলে কমিউনিস্ট ঘরানার বিপ্লবী লক্ষ্য তো পূরণ হওয়ার নয়। সেই যুক্তি মোটেই ফেলে দেবার নয়। কিন্তু আজকের বাস্তব হল যে পৃথিবীজুড়ে দক্ষিণপন্থী ও অতি-দক্ষিণপন্থী রাজনীতির এমন রমরমা যে একুশ শতকে একটি নয়া জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রায় একটা আস্ত বিপ্লবের সমান।

কিন্তু এই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র চালনার জন্য টাকা আসবে কোথা থেকে? সহজ উত্তর হল আমাদের দেশের ধনী এক শতাংশের উপর নতুন কর চাপিয়ে। অর্থনীতিবিদরা ভালোই জানেন যে আমাদের দেশে এই সব থেকে ধনী এক শতাংশের রোজগার প্রায় তিন দশকের আর্থিক উদারীকরণের জমানায় যে বিপুল হারে বেড়েছে সেই তুলনায় তাঁরা সরকারি কোষাগারে বেশ কম হারে কর দিয়ে থাকেন। এবং বহু ক্ষেত্রে সরকার তাঁদের কর মকুব করেন। এখন তো বড়ো কর্পোরেট পুঁজির ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করাও মকুব করছে সরকারি ব্যাঙ্ক। কয়েক মাস আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি হিসেব দিয়েছিল যেখানে দেখা যাচ্ছে এপ্রিল ২০১৪ থেকে এপ্রিল ২০১৮-র মধ্যে একুশটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বড়ো ঋণখেলাপিদের তিন লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশো কোটি টাকা ঋণ মকুব করেছে। এই বিপুল অঙ্কের টাকা ২০১৮-১৯ সালের বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ প্রায় এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার কোটি টাকার দ্বিগুণেরও বেশি।

তাই কংগ্রেসকে যদি ভারতীয় রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে টিকে থাকতে হয় তা হলে তাদের একটা মতাদর্শগত রূপান্তর ঘটাতে হবে। একবিংশ শতাব্দীতে বিংশ শতাব্দীর সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্র যেমন চলবে না তেমনই নব-উদারবাদের ফলে উদ্ভূত আর্থিক বৈষম্য ও কাজের দাবিকে সামনে রেখে নব্য ঘরানার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতি দরকার। কংগ্রেস দল নেহরুর রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের নীতি ও কিছু জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ ভুলে গিয়ে ১৯৯০-র দশক থেকে যে নব-উদারবাদের ঢক্কানিনাদে মজেছিল তার সীমাবদ্ধতা মানুষ দেখেছে। তাই কেবল মোদী-বিজেপি খারাপ বলে সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেসের পক্ষে আগামী দিনে বড়ো জনসমর্থন জোগাড় করা সহজ হবে না। যেটা কংগ্রেস করতে পারে সেটা হল একটা সিরিয়াস বিকল্প মানুষের সামনে রাখা। এই বিকল্প এমন কিছু নতুন নয়। গত চার-পাঁচ বছর ধরে ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি একবিংশ শতাব্দীর জন্য একটা সামাজিক রাষ্ট্রের কথা বলছেন। সেই ধরনের সামাজিক রাষ্ট্র মূলত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেনশন এবং বিভিন্ন প্রকারের ভাতা দেবার দায়িত্ব নেবে। এবং সেই সামাজিক রাষ্ট্রের টাকা আসবে ধনী মানুষের উপর নতুন কর চাপিয়ে এবং পুঁজির উপর একটা সার্বিক ট্যাক্স বসিয়ে। এই রাজনৈতিক-অর্থনীতির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে না পারলে কেবল ভোটের আগে গরিব-গুর্বো, কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থের কথা বলা হবে কিন্তু ভোটে জেতার পরে আবার তাদের কথা ভুলে যাওয়া হবে। এই কাজ কেন্দ্রের শাসক দল করেছে এবং গত এক বছরে বিভিন্ন নির্বাচনে সাধারণ মানুষ তিতিবিরক্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। কিন্তু কেবল কৃষকঋণ মকুব করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে ভারতীয় কৃষির কোনও কাঠামোগত পরিবর্তন হবে না। অন্য দিকে আগামী দিনে পুঁজিনিবিড় শিল্প ও পুঁজিকেন্দ্রিক নগরায়নের ফলে খুব বেশি কর্মসংস্থান যে হবে, তার আশা ক্ষীণ। অথচ লক্ষ-কোটি জনগণকে খাইয়ে পরিয়ে রাখতে হবে। কেবল মানবিকতার কারণে নয়। তাদের ভোটাধিকার আছে এবং সেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তারা সবক শেখাতে পারে সেই কারণেও বটে। এই ভোট-কেন্দ্রিক পপুলিস্ট রাজনীতির সারবত্তা হল, ভোটার-সর্বস্ব গণতন্ত্রের এক জনই ভাগ্যবিধাতা। ভোটার। তাকে অবজ্ঞা করার সাধ্য কার? ভোটারকে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'টেকেন ফর গ্র্যান্টেড' নিলে আর অত্যধিক উন্নাসিকতা ও অহমিকা থাকলে যে কী হয়, তা আশা করা যায়, কেন্দ্রের শাসক দল হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। আর রাজনীতির শিক্ষকদের কাছে ভারতীয় গণতন্ত্রের গতিশীলতা, নিয়ম, বেনিয়ম, ভরসা ও অনিশ্চয়তার বৈশিষ্টগুলো নতুন শিক্ষা ও গবেষণার রসদ জোগায়।

ফিরে দেখা ২০১৮
প্রসঙ্গ কংগ্রেস

> কেবল কৃষকঋণ মকুব করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে ভারতীয় কৃষির কোনও কাঠামোগত পরিবর্তন হবে না। অন্য দিকে আগামী দিনে পুঁজিনিবিড় শিল্প ও পুঁজিকেন্দ্রিক নগরায়নের ফলে খুব বেশি কর্মসংস্থান যে হবে, তার আশা ক্ষীণ।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক